International
Federation
of Journalists

JACQUELINE PARK
IFJ Asia-Pacific Director
ELISABETH COSTA
General Secretary

পরিস্থিতি প্রতিবেদনঃ বাংলাদেশ

রাজনৈতিক ক্রসফায়ারে সাংবাদিকতা

বাংলাদেশে রাজনীতির মেরুকরণের গভীর প্রভাব সাংবাদিকতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুভূত হচ্ছে। ২০১৩ সালের শেষে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন রাজনৈতিক মতবিরোধ ও সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮ সালে সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে দেশের মহান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ তার জোটের শরিক দলের সঙ্গে এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রীতির কোন আচরণই নেই। বিরোধীদল সংসদের অধিবেশন বয়কট করে চলেছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যায্য চাপ দানের অভিযোগ রয়েছে এবং সুশীল সমাজ প্রায়শঃ বিরোধী দলের প্রতি ঝুঁকে থাকে।

নির্বাচন আসন্ন হওয়ার প্রাক্কালে ২০১১ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সরকার সংসদের মাধ্যমে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করে বৈরীতার আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু তৈরী করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এই পঞ্চদশ সংশোধনী একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। এতে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মের বিষয়টির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু পরে আবার ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতার মূল্যবোধের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদা উন্নত করে ‘জাতির পিতা’ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি অফিসসমূহে তার ছবি রাখতে হবে এবং পাকিস্তান থেকে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মার্চে দেয়া দুটি ঐতিহাসিক ভাষণ সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে জনগণের ভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়ের ভিত্তিতে না হলে শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, সংবিধানে কার্যকরভাবে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে যে “সংবিধানের মৌলিক বিধানসমূহ সংশোধন করা যাবে না।”

Supported by UNESCO under the IPDC Programme

আওয়ামী লীগ এই আস্থায় কাজ করে যাচ্ছে যে ২০০৮ সালের নির্বাচনে লাভ করা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদেরকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ: আধুনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ম্যান্ডেড দিয়েছে। নির্বাচনী রায়কে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করার জন্য তাদের আাগের মেয়াদের অসমাপ্ত এজেন্ডা সমাপ্ত করার অনুমোদন দিয়েছে। হত্যাকাণ্ডের দুই দশকের বেশী সময় পরে ১৯৯৭ সালে বিচার কাজ শুরু এবং রায় প্রদান করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার কারণে মামলার প্রক্রিয়া আপীল পর্যায়ে স্থগিত হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহন করার পর শেষ পর্যন্ত সকল আপীল খারিজ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের নৃশংস হত্যাকান্ডের সময় বেঁচে যাওয়া তার পরিকৎবারের দুই সদস্যের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহন করেন।

শেখ মুজিবের হত্যাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত নয় জনের মধ্যে বাংলাদেশের আইনী ব্যবস্থার আওতায় থাকা পাঁচজনের ফাঁসি ২০১০ সালে কার্যকর করা হয়। এমনকি নৈতিকভাবে যারা মৃত্যু দণ্ডের বিরোধী তারাও স্বীকার করেছেন যে, শেখ মুজিবের নয় বছরের পুত্রকে হত্যা করা সহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য এই বিচার আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল। আওয়ামী লীগ মনে করে যে, এই বিচার সম্পন্ন করা দেশের মৌলিক মূল্যবোধসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ভিন্ন মত প্রকাশের পথ বেছে নিয়ে নীরব থেকেছে যখন জনমত ও গণমাধ্যম ছিল হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করার ব্যাপারে সরব। হত্যাকারীরা বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকলে বহু বছর ধরে সুরক্ষা পেয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইনের শাসনের প্রতি দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে ঘটনা ও তার মূল্যবোধের একটি প্রতীকি মূল্যায়ন করেছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ইংরেজী দৈনিক নিউ এজ সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ভিন্নধর্মী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এটি সম্পাদকীয়তে বলেছে,“ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শেখ মুজিবের শাসন ব্যবস্থা উৎখাতের ব্যাপারে বিদ্যমান রাজনৈতিক বিতর্ক দোষীদের লাশ দাফনের মধ্য দিয়েই সমাহিত হবে না।” বরং “সমাজে হত্যার রাজনীতির অপপ্রয়াস, তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিণতি এবং ৩৪ বছর আগেকার অপপ্রয়াসের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের মুক্তির উপায় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তথ্য ভিত্তিক বিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে।”

বাংলাদেশের সর্বাধিক বিক্রিত ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার আরো বেশী ইতিবাচক মূল্যায়নে বলেছে: "এটি হচ্ছে এই জাতির জন্য সাধারণভাবে এবং অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এই মহান ধারণায় ফিরে যাওয়া যে, আইনের শাসন কার্যকর এবং ন্যায়বিচার হচ্ছে শেষ কথা, যেখানে অপরাধ করে কোন ব্যক্তি পার পেতে পারে না। নিঃসন্দেহে এখন বলা যায় যে, আইনী প্রক্রিয়া ন্যায় বিচারের নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছে এবং একটি উন্নত, গণতান্ত্রিক ও সুষম ভবিষ্যতের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অগ্রযাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কালো ছায়ার ওপর আলোকপাত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শ ও দলমত নির্বিশেষ সকল নাগরিকের জন্য এখনই হচ্ছে সঠিক সময়।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ফাঁসি কার্যকর ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ের অবসান হলেও, দেশের দ্বন্দ্বপূর্ণ ইতিহাসের অনেকগুলো বিষয়ই এখনো ছায়াপাত করে চলেছে। ২০০৯ সালে এবং পরের বছরগুলোতে যখন শেখ হাসিনা সরকার ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে নৃশংসতার দায়ে দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য তাদের আগ্রহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে, তখন আশা করা হয়েছিল যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত চার দশকের ইতিহাস সম্পর্কে একটি নতুন ঐকমত্য গড়ে ওঠবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা হয়েছিল যে, এই বিষয়টি বিশেষ করে শেখ মুজিব ও তার পরিবারের অধিকাংশ লোককে হত্যা করার পর থেকে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমে বিদ্যমান বিভক্তির অবসানে কাজ করবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (আইসিটি) গঠন এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদর্শের মতবিরোধের ইস্যুগুলোতে ঐকমত্য ফিরিয়ে আনার উপলক্ষ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছিল।

আইসিটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই যে আশা নিয়ে তা গঠিত হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি কঠিন পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১১ সালের ২ অক্টোবর দৈনিক নিউ এজ পত্রিকার মতামত পাতায় "আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের জন্য একটি সঙ্কটময় সময়" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নিবন্ধের লেখক হচ্ছেন বিশেষ তদন্ত বিষয়ক নিউ এজ সম্পাদক ডেভিড বার্গম্যান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহ নিয়ে কর্মরত এই বৃটিশ নাগরিক ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশে বসবাস করছেন। আইসিটি নিবন্ধের কয়েকটি ইস্যু নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করে এবং তিনদিন পর নিবন্ধের লেখক, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশককে কেন আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না মর্মে একটি নোটিশ জারি করে।

নিবন্ধের কোন কোন স্থানে নোটিশের উল্লেখ রয়েছে যাতে জনগণের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এতে মনে হয় যে আইসিটিতে বিচারের জন্য সম্মুখীন করা কয়েকজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং চার দশক আগের ঘটনাবলী সম্পর্কে একক সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত করার আকাঙ্খাসহ বিচারিক প্রক্রিয়ার দুর্বলতার বিষয়ে পূর্বধারণা বিদ্যমান রয়েছে। নিবন্ধে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইসিটি বিচার প্রক্রিয়ায় গ্রহন করা সাতচল্লিশ জন সাক্ষীর মধ্যে পনের জনের সাক্ষ্য গ্রহনের অনুমতি প্রদান করেছে। সকল অপরাধ আমলে নেয়ার আগে এসব সাক্ষীদের সাক্ষ্য মূল্যায়নের ব্যাপারে আইসিটির সামর্থ সম্পর্কে তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সুষ্ঠু বিচারের দাবী করার মধ্যে কোন আদালত অবমাননা হয়না

নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবির ২০১১ সালের ২৩ অক্টোবর আইসিটিতে একটি বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন এবং তিনি এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সংঘটিত অপরাধের ব্যাপারে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো ব্যাপক বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আইসিটি'র গৃহীত বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার চেয়ে বরং নিউ এজ 'ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিচারের প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ' অব্যাহতভাবে পরিবেশন করে আসছে। 'বিচারের যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা' জোরদার করার লক্ষ্যে বিচারিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস সবল রাখতে আইসিটি'র 'কার্যধারার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ' সময়ে সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। নূরুল কবির বলেছেন, 'বিচার সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মান বজায় রেখে কার্যবিধি অনুসরণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত, বিচ্যুতি থেকে সরে আসার' বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত চিহ্নিত করতে গঠনমূলক সমালোচনার চেতনায় আইসিটি'র প্রশ্ন নিবন্ধে বিশ্লেষন করা হয়েছে। 'এ বিষয়ে বিগত বছরগুলোতে নিউ এজ যে সুস্পষ্ট সমর্থন দিয়ে এসেছে তারই আলোকে, তার পাঠকদের মধ্যে সন্দেহ থাকতে পারে যে এই নিবন্ধের লক্ষ্য ছিল 'বিচারের কার্য প্রক্রিয়ায় ব্যাপকতর গ্রহনযোগ্যতার লক্ষ্যে ট্রাইবুনালের কার্যধারা পরিবর্তনে সহায়তা করা'।

কবির আরো উল্লেখ করেছেন যে, তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার পর পরই, আইসিটি তার আইন সম্পর্কে তার জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রশংসা ব্যক্ত করেছে যে, এই জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে তিনি আইসিটি'র বিচার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে, বিচারকগণ ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন এ বিষয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন তাতে কঠোর মনোভাব ফুটে ওঠে। আদালত

অবমাননার অভিযোগ আনার পর গণমাধ্যমের তিন জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়, যদিও বিচারকগণ প্রশ্নবিদ্ধ নিবন্ধে নিঃসন্দেহে অবমাননামূলক বিষয় থাকলেও তা বিবেচনায় গ্রহন করেননি। নিউ এজ সম্পাদক ও নিবন্ধের লেখককে আইসিটি কঠোর ভাষায় 'সতর্ক' করেছে এবং আইনের চেতনা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো বেশী মনোযোগী হতে পরামর্শ দিয়েছে। কবিরের শুনানি গ্রহনকালে বিদ্যমান মনোভাবের বিপরীতে, ট্রাইবুনাল 'আইনগত প্রক্রিয়া' সম্পর্কে সম্পাদককে অজ্ঞ বিবেচনা করেছে। এছাড়াও, আইসিটি বলেছে যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক কোন এটর্নী নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। আইসিটি কোন ধরনের দুঃখ প্রকাশের ব্যাপারে সাংবাদিকের অনীহা বিবেচনা না করেই তারা তাদের মহানুভবতার নিদর্শন হিসেবে তাকে অব্যাহতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আইসিটি'র শুনানি শুরু হওয়ার পর থেকেই বিচার প্রক্রিয়া এবং জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে আপত্তি শুনা যাচ্ছিল। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ২০১১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরকালে বিচার প্রক্রিয়াকে 'আবশ্যক' বলে বর্ণনা করেছেন। তবে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরার ব্যাপারে সতর্ক ছিল। যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে নথিপত্র তৈরী এবং বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ঐকমত্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের প্রয়াসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এম এ হাসান একমত প্রকাশ করেছেন, যেভাবে বিষয়টি গ্রহন করা হয়েছে তা 'খণ্ডিত'। তিনি বলেন, "আমরা এমনকি বরফখণ্ডের প্রান্তসীমার অগ্রভাগও স্পর্শ করতে পারিনি, কারণ অপরাধগুলোর ৯৫ শতাংশ করেছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী।"

মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ ও প্রচার অভিযানমূলক প্রথম সারির সংস্থা অধিকার বিচার কার্যে সংশ্লিষ্টরা যেভাবে গণমাধ্যমের অসন্তোষের মধ্যে কাজ করছিল সে ব্যাপারে সতর্কতা ব্যক্ত করেছিল। "টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বিচারকদের কাছে সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দিতে দেখা গেছে যা পরে সম্প্রচার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের উচিত হচ্ছে অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের অধিকার এবং বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।" অধিকার এ বিষয়ে সাক্ষীদের সুরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরাও সতর্ক করেছিল যে, 'গণমাধ্যমের সামনে বিচার অনুষ্ঠান' সুষ্ঠু বিচারিক প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা এবং বিচারের ক্ষেত্রে সততা সম্পর্কে জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন করতে পারে।

বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনমনে বিশেষ অনুসন্ধিৎসার এসব যথেষ্ঠ কারণ থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে আইসিটি বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে কোন ধরণের সমালোচনার বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা রয়েছে। এই মনোভাবটি গণমাধ্যমের একাংশের মাধ্যমে প্রায়শঃই প্রকাশ পাচ্ছে। চলতি বছরের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে কাতার ভিত্তিক স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল আল-জাজিরা আইসিটি বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং এতে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক দল জামায়াত ইসলামী দলের সাবেক আমীর গোলাম আযমের বিচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে গোলাম আযমের বিরোধিতা ছিল সর্বসমক্ষে উল্লেখিত একটি অঙ্গীকার এবং মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এমনকি শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের তিন বছর পর দেশে ফিরে আসার আগে তিনি অনেক বছর বিদেশে নির্বাসনে কাটিয়েছেন। তারপর থেকে জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে বিএনপি'র সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংসদে আসন লাভের সামর্থ থাকলেও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি নগণ্য, এটি বিভিন্ন সংসদীয় আসনে প্রায়ই কেবল একটু নাড়া দেয়ার ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিপুল সম্পদের ভিত্তি নিশ্চিত করেছে। জামায়াত ব্যাংক সহ বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেছে যা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব জোরদার করেছে।

নব্বুই বছর বয়সী গোলাম আযমের বিচার বিরোধী মহলের কাছে ভিন্ন মত স্তব্ধ করে দেয়ার একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মহলে তা একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা একটি জবাবদিহিতার বিষয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে যারা স্থানীয় রাজনীতিতে অন্যায্য খ্যাতি বজায় রাখার জন্য তেল সমৃদ্ধ আরব বিশ্বসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করেছে।

আইসিটি সম্পর্কে আল-জাজিরার রিপোর্টিং ইসলাম সংশ্লিষ্ট ব্যাপকতর ভূরাজনৈতিক বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ডেইলী স্টার একদিনের মধ্যেই বেশ কিছু আইনী কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি সংবাদ প্রতিবেদনে বলেছে যে, আল-জাজিরা "বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা উস্কে দিতে" পারে। এটি ছিল আল-জাজিরার প্রতিবেদকের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি সরাসরি জবাব। রিপোর্টার বলেছেন যে, 'এই আদালতের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, এ ফলাফল হবে নাটকীয়। এতে অনেকের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেও তার মূল্য হিসেবে বাংলাদেশ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে।" পরের দিন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে মত প্রকাশের স্বাধীনতার

অধিকারের বিষয়ে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং আল-জাজিরার প্রতিবেদনে উল্লেখিত ‘বাংলাদেশে চলমান যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া দেশকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ঠেলে দিতে পারে’ বলে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ‘অসন্তোষ’ ব্যক্ত করেছে। সম্পাদকীয়তে সর্বশেষে সকল ‘সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় সংবাদ সংস্থাগুলোকে অপ্রয়োজনীয় গুজব এড়িয়ে যেতে এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিচারের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার’ আহ্বান জানিয়েছে।

এই মিশনের সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ কালে সিনিয়র সাংবাদিকরা আইসিটিকে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। আল-জাজিরা রিপোর্টটি সম্ভবত অত্যন্ত বেশী সমালোচনামূলক এবং ইসলামপন্থী গ্রুপগুলোর প্রতি অপ্রয়োজনীয় সমর্থনমূলক হয়েছে। ঢাকায় গণমাধ্যমের আরেকটি ভিন্ন মত হচ্ছে যে, বিষয়টিকে বরং ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল-জাজিরা রিপোর্টটি তিন মিনিটের বেশী দীর্ঘ ছিল না এবং সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত ক্ষোভ প্রকাশ করে যা বলা হয়েছে তা অতিমাত্রায় নিরাপত্তাহীনতার একটি সূচক ছাড়া আর কিছু নয়।

আরেকজন জামাত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর বিচারের প্রক্রিয়ায় সাক্ষী হিসেবে একজন পুলিশ কর্মকর্তার সংগৃহীত পনের জন সাক্ষীকে হাজির করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়েছে বলে ফেনী জেলার আইনজীবীদের একটি গ্রুপের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করার পর আইসিটি ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক ও রিপোর্টারকে তলব করেছিল। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক শুনানির পর ট্রাইবুনাল দুই সাংবাদিককে আটকাদেশ প্রদান করে। আদালত অবমাননার বিষয়টি দিনের শেষে শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হলেও, আইসিটির অভ্যন্তরেই সাংবাদিকদের জন্য তা কেবল আধা ঘন্টার আটকাদেশ বলে বিবেচিত হয় না।

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা উদ্বিগ্ন যে, আইসিটিকে ক্ষমতা প্রদানকারী আইনে সকল রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাবে। আদালত অবমাননা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে একবছর পর্যন্ত কারদণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ড প্রদান করা হতে পারে এবং কোন আপীল করা যাবে না। এই মিশনের সঙ্গে সাক্ষাতকালে আইসিটি মুখপাত্র স্বীকার করেছেন যে, এটি হচ্ছে একটি বিশেষ বিচারিক কর্তৃপক্ষ যা কেবল বিশেষ একটি কারণেই গঠন করা হয়েছে। তারা সতর্কতার সঙ্গে ও উদারভাবে তা প্রয়োগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

জনগণের কাছে তাদের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ও বিদ্যমান আস্থার বিষয়টিকে গণমাধ্যমের মন্তব্যের মাধ্যমে ক্ষুন্ন করা হয়েছে যা যাচাই-বাছাই ছাড়া ও মন্তব্যহীন অবস্থায় পার পেতে পারে না।

আমার দেশ অব্যাহত হয়রানির শিকার

একটি সংবাদপত্র যা অব্যাহতভাবে হুমকি ও আইনগত হয়রানির সম্মুখীন তা হচ্ছে আমার দেশ। এই সংবাদপত্রটি ২০০৯ সালে টেকনোক্রেট মাহমুদুর রহমান কিনে নেয়ার পর সেটিকে বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনামূলক রিপোর্টিং ও বিশ্লেষণের একটি প্লাটফরমে পরিণত করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর জ্বালানি নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মাহমুদুর রহমান সংবাদপত্রটি ক্রয় করার ব্যাপারে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার দেশ ২০০৯ সালে আর্থিক দিক থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং সংবাদপত্রটিকে টিকিয়ে রাখতে পারে এমন কোন বিনিয়োগ তহবিলের জন্য কর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল। মাহমুদুর রহমান তখন তার সিরামিক ব্যবসার অর্থ গুটিয়ে নিয়ে আমার দেশ পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার কিছু অংশ বিনিয়োগ করেছেন।

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার দেশ পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের একজন শীর্ষ পর্যায়ের নীতি বিষয়ক উপদেষ্টার বিশেষ সুপারিশের ভিত্তিতে একটি মার্কিন তেল কোম্পানীর সঙ্গে লেনদেন সংক্রান্ত একটি খবর বিশেষ সংবাদদাতা আবদুল্লাহর নামসহ ছাপা হয়। রিপোর্টিটি প্রকাশ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে আবদুল্লাহ ঢাকার কাওরানবাজার এলাকায় তার অফিসের কাছেই হামলার শিকার হন। হামলাকারীরা তার গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। সাংবাদিক এ সময় তার অফিসের নিরাপদ স্থানে পৌঁছার সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করে মারাত্মক আঘাত থেকে রক্ষা পান। এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই, আমার দেশ পত্রিকার বিরুদ্ধে এর সম্পাদক ও প্রকাশককে প্রধান আসামী করে দায়ের করা কয়েকটি আদালত অবমাননা মামলার প্রথমটি দায়ের করা হয়। মাহমুদুর রহমান এসব মামলায় গ্রেফতার হওয়া থেকে রেহাই পেতে অন্তর্বর্তী জামিন লাভ করেন। কিন্তু, ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তার ওপর হামলা চালানো হয়। তিনি আহত না হলেও তিনি যে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন সেটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০১০ সালের মার্চ মাসে আমার দেশ পত্রিকার সাবেক মালিকের সম্মতির ভিত্তিতে মালিকানা পরিবর্তনের জন্য পেশ করা মাহমুদুর রহমানের আবেদনটি নাকচ করে দেয়া হয় এই যুক্তিতে যে তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো ফৌজদারি মামলা রয়েছে বলে তিনি গণমাধ্যমের যে কোন ক্ষেত্রে মালিকানার হিস্যা পাওয়ার কোন যোগ্যতা তার নেই। ২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকার আমার দেশ পত্রিকার 'ডিক্লারেশন' বা স্থানীয় আইনের নিবন্ধন বাতিল ঘোষণা করে এই ভিত্তিতে যে, অনুমোদিত বা সুনির্দিষ্ট প্রকাশক না থাকা আইনের লংঘন। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাছ থেকে এই ধরণের সুপারিশ পাওয়ার পর সংবাদপত্রটি বন্ধ করে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

মাহমুদুর রহমান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট ডিভিশন থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়ার আদেশ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি রদ করার যে কোন প্রয়াসে সন্দেহজনক দুরভিসন্ধির কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকলে দেশের আইনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলকে (বিপিসি) সংবাদপত্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং নিবন্ধন ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ২০১০ সালের জুন মাসে আমার দেশ পত্রিকার আগের প্রকাশকের কথিত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, একটি মার্কিন কোম্পানীর সঙ্গে জ্বালানি চুক্তির বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের কোন ভিত্তি ছিল না। পত্রিকাটির সেদিনের সংখ্যাটি যখন ছাপার জন্য প্রেসে যাচ্ছিল ঠিক তখন ইউনিফরম পরিহিত ও অস্ত্রসজ্জিত বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য আমার দেশ পত্রিকার কাওরান বাজার অফিস থেকে তাকে গ্রেফতার করে। কাওরান বাজার এলাকাটি বর্তমানে ঢাকায় গণমাধ্যম শিল্পের একটি কেন্দ্রস্থল হওয়ায় বেশ কিছু গণমাধ্যম কর্মী তাৎক্ষণিকভাবে আমার দেশ কার্যালয়ে সমবেত হয়ে সরাসরি দর্শকদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে। সাংবাদিক মহল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার নিন্দা জানায়।

যে থানায় মাহমুদুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয় সেটি বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দলের স্বতঃস্ফুর্ত রাজনৈতিক বিক্ষোভের একটি স্থানে পরিণত হয়। কয়েকদিন আটক থাকার পর তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু ২০১০ সালের আগস্ট মাসে সুপ্রীম কোর্ট তার সঙ্গে রিপোর্টার ওয়ালিউল্লাহ নোমান ও আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশককে আদালত অবমাননার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। সুপ্রীম কোর্টের বেঞ্চ বর্তমান সরকারের অনুকুলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে আগ্রহী বলে আমার দেশ পত্রিকায় ২১ এপ্রিল একটি খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বারের দুজন সদস্য আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করেন।

ওয়ালিউল্লাহ নোমানকে এক মাসের কারাদণ্ড, বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০,০০০ টাকা (তখনকার মুদ্রা বিনিময় হার অনুযায়ী ১৫০ ডলার) জরিমানা এবং মাহমুদুর রহমানকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ১০০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। প্রকাশক হাশমত আলীকে জরিমানা করা হয় ১০,০০০ টাকা। নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করার পর আমার দেশ পত্রিকার আরো দুই কর্মীকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে আদালত অবমাননা মামলায় এটি প্রথম দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনা বলে জানা গেছে। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের পূর্ণ বেঞ্চে দেয়া এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সংগঠনগুলো এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো এই বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, মাহমুদুর রহমান ছিলেন বিরোধী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অনেককে গণমাধ্যমের স্বার্থ আদায়ের বিষয়ে বিরোধী রাজনীতির পথ অনুসরণ করতে দেখা গেছে।

সম্পাদকীয়তে বিবৃত প্রতিক্রিয়া ছিল সিদ্ধান্তহীন, তবে সতর্ক ও বিচারিক রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ডেইলী স্টার মন্তব্য করেছিল যে, আদালত অবমাননা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে 'বিচার বিভাগের মর্যাদা' বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন কিছুই করার নেই। দুই বছরের কম সময় আগে বেসামরিক নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়েছে, 'আমাদের এখন প্রয়োজন হচ্ছে সকল প্রতিষ্ঠান জোরদারকরণের লক্ষ্যে সুপ্রীম জুডিসিয়ারির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ নেতৃত্ব যা বিচার বিভাগসহ সকল প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা ও ব্যক্তি পর্যায়ে আরো বেশী স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।'

সুপরিচিত বাংলাদেশী বিশ্লেষক এবং মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক প্রধান আইরিন খান মন্তব্য করেছেন যে, 'আধুনিক সর্বোত্তম চর্চা বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট আইনে আদালত অবমাননার একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং বিচার প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা থাকতে হবে।' তবে দায়িত্ব শুধুমাত্র বিচার বিভাগের ওপর বর্তায় না। তিনি আরো যুক্তি দেখিয়েছেন যে, 'গণমাধ্যম ও বিচার বিভাগের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এই বিষয়টি স্বীকার করার জন্য গণমাধ্যমের ওপর দায়িত্ব অর্পন করে যে, স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতাও আসে- আর তা হচ্ছে সুষ্ঠু রিপোর্টিংয়ের দায়িত্বশীলতা।'

মাহমুদুর রহমান ও ওলিউল্লাহ নোমান পূর্ণ মেয়াদ কারাদণ্ড ভোগ করেছেন এবং মাহমুদুর রহমান জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় আরো একমাস কারাভোগ করেন। ২০১১ সালের মার্চ মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর থেকে মাহমুদুর রহমানকে তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দায়ের করা অনেকগুলো মানহান মামলায় হাজির হতে হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে খবর প্রকাশ করার কারণে একটি মানহানি মামলায় ২০১২ সালের ২৭ মার্চ ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট তার এবং অলিউল্লাহ নোমান সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে।

মাহমুদুর রহমানের হিসাব অনুযায়ী তিনি কমপক্ষে ৫৩ টি মামলার সম্মুখীন এবং এসব মামলার অনেকগুলোতেই আওয়ামী লীগ সদস্যরা আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন এবং নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, অনেক যুদ্ধাপরাধী ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়ে রয়েছে। বিটিআরসি'র মানহানি মামলা ছাড়াও, ২০১১ সালের জুন মাসে মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করার পর যে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার বাইরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভ থেকে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ও পুলিশের কাজে বাধাদানের মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। মাহমুদুর রহমানকে এখন বিভিন্ন সমনের জবাব দিতে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

আমার দেশ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্যে বাংলাদেশে খুব কম লোকই একমত হয়েছে। তার ব্যাপারে অনেক সাংবাদিক গোষ্ঠীই জড়িত হওয়া থেকে বিরত থেকেছে। এক্ষেত্রে একটি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এই বিষয়টি যতটা না পেশাগত তার চেয়ে বরং অনেক বেশী রাজনৈতিক। বলা বাহুল্য, এমন অনেকে রয়েছেন যারা আমার দেশ পত্রিকার সংবাদ পরিবেশনের মান, মাত্রাতিরিক্ত মতামত প্রকাশ এবং ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভিত্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নিয়ে খোলাখুলি সমালোচনা করেন।

চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে

নির্বাচন এগিয়ে আসার মুহূর্তে আমার দেশ পত্রিকার এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্কে বৈরী মনোভাব বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে। সাম্প্রতিক কয়েক মাসের ঘটনাবলীর অন্যতম হচ্ছে ২০১২ সালের ১২ মার্চ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের রাজনৈতিক সমাবেশ। এই সমাবেশ থেকে বিএনপি নেতা খালেদা জিয়ার বক্তৃতা চলাকালে

মহানগরীতে বসবাসকারী দর্শকদের জন্য তিনটি টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এই তিনটি চ্যানেল হচ্ছে একুশে টেলিভিশন, বাংলা ভিশন এবং ইসলামিক টিভি। এই চ্যানেলগুলো সেদিন বিরোধী দলীয় নেতার বক্তৃতা শুরুর প্রায় এক ঘন্টা আগে বেলা ৩টা থেকে বক্তৃতা শেষ হওয়া পর সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত দর্শকরা দেখতে পায়নি। এসব টিভি চ্যানেলের কর্মীরা জানিয়েছেন যে, উল্লেখিত সময়ে এই তিনটি চ্যানেলের সম্প্রচার স্থগিত রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাবল অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। আরো খবর পাওয়া গেছে যে, সম্পচারের জন্য স্পেকট্রাম ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থা বিটিআরসি সম্ভবত বিরোধী দলের সমাবেশ অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য কয়েকটি চ্যানেলে সম্প্রচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছিল।

এই ঘটনার পর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তিন বছরের কর রিটার্ন দাখিল না করার জন্য একুশে টেলিভিশনকে নোটিশ প্রদান করে। চ্যানেলটি দাবী করেছে, তারা বাজারে শেয়ারের আইপিও ছাড়ার প্রস্তুতি গ্রহনের কারণে এই বছরগুলোর আর্থিক বিবরণী তখনও প্রস্তুত করেনি। এই ওজর খুব বেশী কার্যকর বিবেচিত না হলেও, এই ঘটনায় আওয়ামী লীগের প্রতি শর্তহীন সমর্থন দেয়নি এমন গণমাধ্যমগুলোর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব এবং গভীর দলীয় বিভক্তির আভাস ফুটে ওঠেছে।

বিটিআরসি এর আগে সম্প্রতি দুবার কয়েকটি টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছিল এই যুক্তিতে যে তারা সম্প্রচারের জন্য স্পেকট্রাম ব্যবহারের আগাম ছাড়পত্র গ্রহন করেনি। সাধারণ নির্বাচন তদারকির জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন সম্পর্কে আওয়ামী ও বিএনপি ঐকমত্যে ব্যর্থ হওয়ার পর ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চলার সময় বিটিআরসি'র নির্দেশে সিএসবি টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এই পদক্ষেপ নেয়ার দুই সপ্তাহ আগে নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোন ধরণের 'উস্কানিমূলক' সংবাদ, টক শো বা তথ্যচিত্র সম্প্রচার না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল।

২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে বর্তমান সরকারের মেয়াদে বিটিআরসি যমুনা টিভির সম্প্রচারের জন্য বরাদ্দ স্পেকট্রাম প্রত্যাহার করে এই যুক্তি দেখিয়ে যে তারা রীতি মাফিক অনুমতি লাভ করেনি। সাত মাস আইনী লড়াইয়ের পর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত বহাল রাখার রায় ঘোষণা করে এবং যমুনা টিভিকে সম্প্রচার স্পেকট্রাম বরাদ্দ লাভের জন্য নতুন করে আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করে।

২০১০ সালের শেষ দিকে, বেসরকারি টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র চ্যানেল ওয়ান বন্ধ করে দেয়ার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) আদেশ প্রদান করে এই যুক্তি দেখিয়ে যে, তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি অন্য ব্যবহারকারীর কাছে হস্তান্তর করেছে। সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে কোন দলগত পক্ষপাতিত্ব করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তবে, এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি যে, এই চ্যানেলের মালিকানা ছিল বিএনপি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একজন সাবেক সংসদ সদস্যের। গুজব শুনা গিয়েছিল যে, এই চ্যানেলের মালিকানা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের নিকটাত্মীয়ের কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে চাপ দেয়া হচ্ছিল।

সংঘাত তীব্রতর

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীতে ইসলামপন্থীদের দ্বারা একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর কথিত প্রয়াস ফাঁস ও দমন করা হয়। তারপর থেকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের সঙ্গে তার বাগযুদ্ধের উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি ওঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, গণমাধ্যম 'অতিরঞ্জনের' দোষে দোষী। তার মেয়াদকালে দেয়া স্বাধীনতা ভোগ করে সংবাদপত্রগুলো 'তাদের ইচ্ছামতো লিখছে, বিষয়টি সঠিক বা ভুল যাই হোক'। বিরোধী দলগুলো যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই স্বাধীনতা সংবাদপত্র ভোগ করতে পারেনি। তিনি আরো বলেছেন, ২০০১ সালের শুরু থেকে বিএনপি'র পুরো মেয়াদকালেই চিহ্নিত মহল থেকে সংবাদপত্রগুলো 'অদৃশ্য উপদেশ' পেতো। তিনি বলেছেন, সেই মেয়াদে ষোল জন সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত মামলাগুলোর একটিও যথাযথভাবে তদন্ত করা হয়নি।

২০১২ সালের ৭ মার্চ ক্ষমতাসীন দল একটি গণসমাবেশ করে, স্পষ্টতঃ তা ছিল ১৩ মার্চ তারিখে বিরোধী দলের শক্তি প্রদর্শনের আগে একটি প্রতিরোধমূলক প্রয়াস। গণমাধ্যমে ৭ মার্চের সমাবেশ অনুষ্ঠান প্রচারকালে নগরীতে সমাবেশের কারণে সৃষ্ট জীবন যাত্রার বিঘ্ন ফুঠে ওঠে। ১৩ মার্চ বিরোধীদলের সমাবেশ অনুষ্ঠানে যাতে বেশী লোকের সমাগম হতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করে, গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচারের সুযোগ দিতে অস্বীকার করে, ফলে সম্পাদকীয়গুলোতে কড়া সমালোচনা করে বলা হয়, 'আওয়ামী লীগের জন্য দুঃখজনক হচ্ছে যে বিরোধী দলকে ঠেকানোর প্রয়াসে তারা নাগরিকদেরই ঠেকিয়েছে। সমাবেশ অনুষ্ঠান থেকে বিরোধী দলকে

ঠেকানোর চেষ্টার ফলে সাধারণ মানুষ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। -- আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি যে, গতকালের বিরোধী দলের কর্মসূচি চলাকালে গণমাধ্যম বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদেরকে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি টিভি স্টেশনকে সমাবেশের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে দেয়া হয়নি। যে কয়টি চ্যানেল এই দিনের কর্মসূচি চলাকালে জনগণের দুর্ভোগের সংবাদ প্রচার করছিল সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন গিয়ে তাদের প্রচারের মাত্রা কমিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমাবেশের পিক আওয়ারে কয়েকটি চ্যানেলের সম্প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য ক্যাবল অপারেটরদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। গণমাধ্যমের কর্মকাণ্ডে এই ধরণের মারাত্মক হস্তক্ষেপ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং জনগণের জানার অধিকার দমনের সামিল।

এর পরপরই খবর পাওয়া যায় যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পিরোজপুর জেলার ১৩ জন সাংবাদিক ১৪ মার্চ তারিখে নিজেদেরকে থানায় সোপর্দ করেন এবং আগের দিন একটি জনসমাবেশ থেকে ক্ষমতাসীন দলে জেলা শাখার দেয়া হুমকি থেকে রক্ষা করার দাবী জানান। নির্বাচিত জেলা পরিষদের দুজন সদস্যের ব্যাপারে স্থানীয় সংবাদপত্রে সমালোচনামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করার পর এই সাংবাদিকদের সহিংস হুমকি প্রদান করা হয় বলে জানা গেছে। রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, স্থানীয় দুই রাজনীতিক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এ সংক্রান্ত খবর পরে ঢাকা ভিত্তিক দৈনিক সংবাদপত্র ও সংবাদ চ্যানেলে পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা পরে সাংবাদিকদের এই বলে হুঁশিয়ার করেছে যে, তারা যদি জেলা পরিষদের নির্বাচিত দুই সদস্যের ব্যাপারে সমালোচনামূলক সংবাদ প্রকাশ অব্যাহত রাখে তাহলে তাদেরকে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হবে অথবা 'টুকরো টুকরো করে কবর দেয়া হবে'।

শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদের সূচনা থেকেই গণমাধ্যমে সমালোচনামূলক মন্তব্যের ব্যাপারে সহিষ্ণুতার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী হিসেবে সর্বশেষ মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহনের এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে যাতে আদালত অবমাননা মামলায় সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক ও লেখকদের গ্রেফতার না করার সুবিধা অনুমোদন করা হয়েছে। নতুন এই সরকারের মেয়াদের প্রথম বছরেই ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি বিধান বাতিল করা হয়েছে যাতে সরকার ইচ্ছা করলে সংবাদপত্র বন্ধ করে দিতে পারতো।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (বিপিসি) ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯৩ সালে পুনরুজ্জীবিত না করা পর্যন্ত সেটি প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। এই সংস্থাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের নিবন্ধন অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে সন্দেহের ভিত্তি পাওয়া গেলে এই সংস্থা হস্তক্ষেপ করে গণমাধ্যমের অধিকার রক্ষা করতে পারে। বিগত বছরগুলোতে কাউন্সিলের একটি অভিমত গড়ে ওঠেছে যে, সাংবাদিকতা পেশায় লাইসেন্সিং জরুরি। পরিকল্পিত বিপিসি মডেল অনুযায়ী বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অনুরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত পেশাজীবি কাউন্সিলের মাধ্যমে আইন পেশা বা চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিতদের মতো সনদপত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

লাইসেন্সধারী সাংবাদিকের ধারণাটি অনেকাংশে বেখাপ্পা মনে হলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে বিষয়টি কিছুটা ভিত্তি পেয়েছে। আর কিছু না হোক, দেশের সাংবাদিকদের মধ্যে উপলব্ধি রয়েছে যে, এমন পেশাগত নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা কতটুকু জরুরি এটি হচ্ছে তারই ইঙ্গিত। বিপিসি'র প্রণীত প্রয়োগযোগ্য আচরণবিধির ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, "মুক্তিযুদ্ধ, এর চেতনা ও আদর্শকে অবশ্যই সমুন্নত ও ধরে রাখতে হবে এবং কোন কিছু মুক্তিযুদ্ধ, এর চেতনা ও আদর্শের পরিপন্থী হলে তা গণমাধ্যমে কোন ভাবেই ছাপা, প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।"

সুস্পষ্টভাবেই, এই নির্দেশনা গণমাধ্যমে চর্চার ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য হোক বা না হোক অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের প্রবণতা নিয়ে একটি কাঠোর রীতি হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। ভাষাগত অপেক্ষাকৃত অধিক মিল থাকা সত্ত্বেও একটি বহুমতের সমাজ হিসেবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ভিন্ন আদর্শ ও মতামত ধারণ করেও ১৯৭১ সালে জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বহুধা বিভক্ত মতের ক্ষেত্রে ঐক্য আনয়নের লক্ষ্যে বিপিসি'র প্রস্তাবিত গণমাধ্যম আচরণ বিধি গণমাধ্যমের নৈতিকতা বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তেমন কোন অবদান রাখেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে বিপিসি নৈতিক বিজয় লাভ করেছে। ২০১১ সালে প্রথম দিকে, বিপিসি দুটি বাংলা সংবাদপত্র কালের কণ্ঠ ও বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পর্কে কঠোর সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত খবরে ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের দলীয় সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় অন্যান্যের মধ্যে দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমানের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত দেয়া

হয়েছিল। এই দুটি সংবাদপত্রের মালিকানায় রয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ এবং রিয়েল এস্টেট ও অন্যান্য খাতে তাদের ব্যাপক স্বার্থ বিদ্যমান।

পরবর্তীতে, বসুন্ধরা গ্রুপের আরেকটি সংবাদপত্র ডেইলী সান দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সাংবাদিকতায় র‍্যামন ম্যাগসায়সায় পদক লাভকারী মতিউর রহমানের বিপক্ষে প্রচারণায় লিপ্ত হয়। ২০১১ সালের জুলাই মাসে প্রবীন সাংবাদিক আবেদ খান বিপিসি'র দিক-নির্দেশনা অনুসরন করে এবং মতিউর রহমানের ব্যাপারে সংবাদপত্রটির মালিকের চাপের ফলে ছেপে দেয়া আপত্তিজনক সংবাদ সংশোধন জন্য বারবার চেষ্টা চালানোর পর কালের কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরামের (বিএমএসএফ) খায়রুজ্জামান কামাল এবং অন্য সিনিয়র সাংবাদিকরা সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে ক্রমবর্ধমান কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন। এই আন্দোলনকর্মীদের মতে, ব্যবসায় সম্পর্কের বিস্তৃত জালে গণমাধ্যমের মিশে যাওয়ার ফলে এ খাতের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হবে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দেশের সবচেয়ে বড় দুটি দৈনিক প্রথম আলো এবং ডেইলী স্টার নিয়ন্ত্রণকারী ট্রান্সকম গ্রুপ অন্যান্য পণ্যের মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় এবং ইলেকট্রনিকস ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায় জড়িত। বসুন্ধরা গ্রুপের সম্পৃক্ততা রয়েছে সিমেন্ট, রিয়েল এস্টেট ও ইস্পাত ব্যবসায়। বৈশাখী টিভি চ্যানেল পরিচালনাকারী ডেসটিনি গ্রুপ মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে তাদের সম্পদ গড়ে তুলেছে এবং বর্তমানে আর্থিক দুর্নীতি করার দায়ে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত। বাংলা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশক যমুনা গ্রুপের বস্ত্র, রিয়েল এস্টেট, রাসায়নিক ও অন্যান্য অনেক খাতে ব্যবসা স্বার্থ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রবর্তনকারী এটিএন গ্রুপেরও অন্যান্য অনেক খাতের মধ্যে বস্ত্র খাতে বিনিয়োগ রয়েছে।

বিএসএমএফ বলেছে,'বেশ কিছু ব্যবসায়ী গ্রুপ সম্প্রসারণশীল গণমাধ্যম বাজারে নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করছে। কর্পোরেট গ্রুপগুলো গণমাধ্যমের মালিকানা সংক্রান্ত বিধি-বিধান শিথিল করার দাবী জানাচ্ছে এবং রাজনৈতিক দান হিসেবে বিপুল অঙ্ক ব্যয় করছে যা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত।

ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোর মধ্যেকার প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ইন্ধন যোগায় বলে তা গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকসুলভ মূল্যবোধ ক্ষুন্ন করে।

একটি অনুমিত রাজনৈতিক বিরোধ

২০১১ সালের ৩১ জুলাই শীর্ষ নিউজ ওয়েব পোর্টাল এবং তাদের সহযোগী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শীর্ষ কাগজের সম্পাদক মোহাম্মদ একরামুল হককে চাঁদাবাজির অভিযোগে ঢাকার একটি এলাকায় অবস্থিত তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে, তাকে চোখ বেধে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গ্রেফতারের সময় পুলিশ তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, বাংলাদেশী মুদ্রায় ২০ লাখ টাকা না দেয়া হলে শীর্ষ নিউজ ওয়েব সাইটে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশের হুমকি দেয়ার জন্য এক সপ্তাহ আগে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর অফিসে দু'জন সাংবাদিককে পাঠিয়েছিলেন।

শীর্ষ নিউজের কর্মী সহ অন্য সাংবাদিকরা এসব অভিযোগ চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তারা দাবী জানিয়েছেন যে, স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একরামুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর উল্লেখিত স্থানে তার কোন অফিস নেই। প্রাথমিকভাবে, ঢাকা সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে দুদিনের রিমান্ডের নির্দেশ দেয়া হলেও বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশনের একজন নেতা একরামুল হকের বিরুদ্ধে নতুন করে আরেকটি চাঁদাবাজির অভিযোগ দায়ের করার পর গত ৩ আগস্ট তার রিমান্ডের মেয়াদ আরো দুদিন বাড়ানো হয়। তিন মাস আটক থাকার পর শেষ পর্যন্ত তাকে জামিন দেয়া হয়।

২০১১ সালের ২৫ অক্টোবর জামিন প্রদানকালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট বলেছে, চাঁদাবাজি মামলার মূল বাদী রাজধানী ঢাকার একজন ফল ব্যবসায়ীর পরিচয় ও ঠিকানা নতুন করে দাখিল করেছেন যা ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। দুঃখজনক হচ্ছে যে, একরামুল হককে জামিনে মুক্ত হওয়ার মুহূর্তে গত ১ নভেম্বর ঢাকা কারাগারের গেটে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ঢাকায় আয়কর বিভাগের একজন কর্মকর্তার অভিযোগের ভিত্তিতে আরেকটি নতুন চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশ সরকার জামিন দানের বিষয়ে হাইকোর্ট বেঞ্চের আদেশটি সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং ২০১১ সালে ২ নভেম্বর শুনানি হওয়ার পর এ বিষয়ে

স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে, গত ৯ অক্টোবর ঢাকার একটি বিচারিক আদালত ইতোমধ্যে দায়ের করা নতুন মামলাগুলোতে তার আটকাদেশ অব্যাহত রাখার আদেশ প্রদান করেছে। পাঁচদিন পর হাই কোর্ট অন্য কোন মামলায় তাকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং হয়রানির অবসান ঘটানোর জন্য আদেশ প্রদান করে। তার পরেও, ২০১১ সালের ২৫ নভেম্বর একরামুল হককে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

একরামুল হকের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলোর প্রক্রিয়া, শুনানি এবং জামিন প্রদানের প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ফলাফলে প্রাথমিক সন্দেহের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রতীয়মান হয় যে, তার বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ ছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রসূত।

বাংলাদেশের পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন যে, ঢাকায় গণপূর্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিযোগ সম্পর্কে তার ওয়েব সাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের কারণেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একরামুল হক নিজেও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারীদের সংখ্যা দেখে বিভ্রান্ত। তাদের কারো সঙ্গেই তার কোন ধরণের আদান-প্রদান ঘটেনি। তিনি আরো অবগত হয়েছেন যে, সেনাবাহিনীর শাখা ডিরেক্টরেট অব ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের নিরাপত্তা হেফাজতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে তার ধারণার ভিত্তিতে তার আটকাবস্থা, জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনকালে মেজর জেনারেল পদমর্যাদার এই শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনরত একজন সেনা কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার উল্লেখ করেছেন।

নিরপেক্ষ মানবাধিকার সংস্থাসমূহ মনে করে যে, একরামুল হক মারত্মক অন্যায়ের শিকার হয়েছেন। তারা একরামুল হকের মুক্তির জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তাসত্ত্বেও তারা মনে করছেন যে, যদি একরামুল হকের পক্ষে তাদের অঙ্গীকার জোরদার করতে হয় তাহলে নির্যাতনের শিকার সাংবাদিকের কাছ থেকে আরো বেশী স্বচ্ছতা দরকার। মানবাধিকার আন্দোলনকারীদের মধ্যে এই ধারণা রয়েছে যে, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স কর্মীদের সঙ্গে সম্ভবত একরামুল হকের কিছু আদান-প্রদান ছিল এবং তার বিরুদ্ধে সেটিই প্রতিহিংসার ঘটনার কারণ হতে পারে যেমন ইউনিটে নিয়োজিতদের পরিবর্তন অথবা অন্য কোন বিষয়ে তিক্ততা। তারা বলছেন, আর কোন তথ্য না থাকলে তার ব্যাপারে তাদের সম্পৃক্ত থাকা কঠিন হবে।

মানহানি সংক্রান্ত মামলাগুলো গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা অব্যাহত থাকতে পারে। ২০১১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী শাজাহান খানের দায়ের করা মামলায় বাংলা সংবাদপত্র দৈনিক যুগান্তরের তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সমন জারি করেন। মন্ত্রী ও তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের বিদেশ ভ্রমনে অধিক অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন তুলে দুটি রিপোর্ট প্রকাশের পর সম্পাদক সালমা ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ও রিপোর্টার জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।

২০১২ সালের ৩১ জানুয়ারি দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ঝিনাইদহের একটি আদালত সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইট ফেসবুকে "আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করার জন্য জামায়াত-ই-ইসলামী পার্টির একজন রাজনৈতিক নেতার পুত্র স্থানীয় ছাত্রকে অভিযুক্ত করে। সে তার ফেসবুকের পাতায় শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে মানহানিকর বলে কথিত মন্তব্য লেখার পর আওয়ামী লীগের অনুগত লোকজনের হাতে তিনি প্রহৃত হয়েছেন। ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন নাকচ করে দিয়ে এই ছাত্রটিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, দোষী সাব্যস্ত করার মতো যথেষ্ঠ তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।

মর্মান্তিক জোড়া খুন

সাম্প্রতিককালে, অন্যতম সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় নিজ বাড়িতে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারওয়ার এবং মেহেরুন রুনির হত্যাকাণ্ড। সারওয়ার ছিল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙ্গার নিউজ এডিটর এবং তার স্ত্রী রুনি ছিল আরেকটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার। ১২ ফেব্রুয়ারি তাদের পাঁচ বছর বয়সী পুত্র তাদের লাশগুলো ছুরিকাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় দেখতে পায়।

সরকারি তদন্তে এ যাবৎ খুব বেশী অগ্রগতি না হওয়ায় বাংলাদেশের সাংবাদিকরা গত ২৭ ফেব্রুযারি এক ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেছে। গণমাধ্যম সংগঠনগুলোর
একটি ব্যাপক ভিত্তিক জোট একটি সার্বিক তদন্তের কাজ সম্পন্ন এবং দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে। যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো ২ মার্চ অনশন কর্মসূচি শুরু করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ জানিয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে কিন্তু সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত প্রকাশ করতে পারছেন না। এদিকে মহানগরীর একটি আদালত এ বিষয়ে 'গণমাধ্যমে অনুমাননির্ভর মন্তব্য' প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য একটি আদেশ জারি করে। এই বিষয়টিকে অনেকেই ন্যায়সঙ্গত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা থেকে বিরত রাখার একটি প্রয়াস হিসেবে মনে করছেন। এই রিপোর্টটি যখন ছাপার জন্য পাঠানো হচ্ছে তখনও পর্যন্ত তদন্তে কোন অগ্রগতি হয়নি, অন্তত জনগণের কাছে তাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

২০১২ সালের ২০ মে এটিএন বাংলা গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছিলেন যে তার কাছে জোড়া খুনের ব্যাপারে তথ্য-প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের কোন কিছুই করার নেই। বাংলাদেশের সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো এর পর থেকে দাবী জানিয়ে আসছে যে তাকে জনসমক্ষে এই প্রমাণ প্রকাশ অথবা বিবৃতি প্রত্যাহার করতে হবে। এই অচলাবস্থা বজায় থাকার ফলে, সাংবাদিক সংগঠনগুলো মাহফুজুর রহমানকে পুলিশের ডিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবী জানিয়ে এটিএন বাংলা কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পরিকল্পনা ঘোষণা করে। বিচারিক একটি নিষেধাজ্ঞা সুবিধা লাভের জন্য মাহফুজুর রহমানের একটি প্রয়াস নাকচ হয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ১০ অক্টোবরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে বলে একজন সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তার আশ্বাস দেয়ার পর এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত তদন্তে কি অগ্রগতি হয়েছে পুলিশ তা জানায়নি।

মজুরী ও সুষ্ঠু কাজের পরিবেশের দাবীতে সংগ্রাম

বিভিন্ন মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের সাংবাদিকদের প্রধান ইউনিয়নগুলো সাংবাদিক শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) গঠন করেছে এবং নতুন ওয়েজ বোর্ড গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দাবীতে ২০১২ সালের মার্চ মাসের শুরুতে একটি সমাবেশ করেছে। ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠককালে তথ্য মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ সুস্পষ্টভাবে আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি মাসের শেষেও গেজেটের মাধ্যমে সংবাদপত্র শিল্পের জন্য অষ্টম ওয়েজ বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয় ব্যর্থ হয়েছে।

নতুন ওয়েজ বোর্ড গঠনের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সংবাদপত্র মালিক সমিতি (নোয়াব) বিরোধিতা করতে শুরু করে। ১৯ মার্চ তারিখে এক বিবৃতিতে নোয়াব বলেছে, 'সপ্তম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণার সাড়ে তিন বছর পর আরেকটি নতুন ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হলে সংবাদপত্র শিল্প একটি বড় সঙ্কটে পড়বে।' স্কপ একদিনের মধেই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, আইন অনুযায়ী একটি বোর্ড গঠনের বিরোধিতা না করে বরং সংবাদপত্র মালিকরা স্বচ্ছতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সহযোগিতার কৌশল গ্রহন করতে পারে।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সংসদে গৃহীত একটি আইনের অধীনে এ যাবৎ মোট সাতটি ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সংবাদপত্র শিল্প বরাবরই এসব ওয়েজ বোর্ড গঠনে বাধা দিয়েছে এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে আইনী লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার পরই কেবল সংবিধিবদ্ধ ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের বিধি প্রতিপালন করেছে। বাস্তবায়ন বিধি প্রতিপালন এখনও পর্যন্ত সামঞ্জস্যহীন ও অসম রয়ে গেছে। অনেকগুলো নতুন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছে এবং মর্যাদাসম্পন্ন মজুরী প্রদানের দায়িত্ব উপেক্ষা করার পথ বেছে নিয়েছে। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও চাকুরির নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ে দেশের সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রবল দাবী উত্থাপনের পর বাংলাদেশ সরকার শেষ পর্যন্ত অষ্টম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা করেছে। বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের উভয় পক্ষ সহ সংবাদপত্র শিল্পের অন্যান্য অংশীদাররা বোর্ডে তাদের প্রতিনিধিদের নাম পাঠিয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত সংবাদ পত্র শিল্পের মালিকদের বিরোধিতা অব্যাহত থাকার কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা বিলম্বিত হচ্ছে।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সাবেক বিচারক ও বিপিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান কাজী এবাদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ২০১২ সালের জুন মাসে পূর্ণ ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

নৈতিকতার মান

গণমাধ্যমের নৈতিকতা ও সর্বোত্তম আচরণের প্রশ্নটি সাধারণ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১০ সালের অক্টোবরে সংসদে এক বিবৃতিতে তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি একটি যথাযথ পেশাভিত্তিক আচরণ বিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। এর প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলের

সংসদ সদস্যরা সংসদের ফ্লোরে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে দুই ঘন্টাব্যাপী তীব্র সমালোচনামূলক আলোচনা করেন। গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষকদের মতে, সংসদ সদস্যদের ক্ষোভ উস্কে দেয়ার কারণ ছিল জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি রিপোর্ট। খবরে বলা হয়েছিল সংসদ সদস্যরা আমদানীকৃত গাড়ির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার এবং বিদেশ ভ্রমন ভাতা প্রদানের দাবী করছেন। সংবাদপত্রের সম্পাদক মতিউর রহমানের নাম উল্লেখ করে তারা সম্পাদকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানান।

বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ছিল গণমাধ্যমে সম্পাদক পদে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য সাংবাদিকতায় তার কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট মহল এ প্রয়াসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার জন্য একটি স্বেচ্ছা আচরণবিধির পক্ষে তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

সরকার ও গণমাধ্যমের মধ্যে এই মতবিরোধের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন দুবার নিউজ বুলেটিন প্রচার করার জন্য ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জন্য সরকারিভাবে নির্দেশ প্রধান করা হয়। এ ব্যাপারে বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিরোধিতা করে এই যুক্তি তুলে ধরে যে দুটি টাইম স্লট ২টা থেকে ৮টা পর্যন্ত হচ্ছে বিজ্ঞাপন থেকে আয় করার মূল্যবান সময় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশনের একঘেঁয়ে সংবাদ প্রচার করে তা নষ্ট করা যায় না। মন্ত্রীবর্গ ও সরকারী কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা সংবাদ সম্প্রচার ও নৈতিক আচরণ বিধির ব্যাপারে নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে রাজি করানোর এবং আলোচনার পথ অনুসরণ করতে চান।

পরিকল্পিত ও একের পর এক হামলা

সাংবাদিকরা সরকারি মহল ও অন্যদের কাছ থেকে একের পর এক হামলার শিকার হচ্ছে। এসব ঘটনার অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পেশাগত আচরণের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ

ইস্যুর কারণে প্রভাবিত। তবে, এগুলোর বেশীর ভাগ হচ্ছে সুযোগ সন্ধানী বা ব্যক্তির ওপর বিচ্ছিন্ন হামলার ঘটনা যা তাদের দায়িত্ব পালনেকালে বা স্থানে ঘটেছে বা ঘটতে পারে।

২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে রাজশাহী জেলায় কর্মরত তরুণ সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আলম আকাশকে সন্ত্রাস দমন বাহিনী র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ধরে নিয়ে যায়। তিনি কথিত বিচার বহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কয়েকটি সংবাদ প্রকাশ করার পর তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছিল। কয়েক মাস পর্যন্ত আটকাদেশ দিয়ে তাকে কারাগারে অন্তরীন রাখা হয় এবং তার জামিন লাভ বা ছাড়িয়ে আনার সব প্রয়াসই আরো কয়েকটি মামলা দায়ের করার কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। ছয় মাস কারাগারে থাকার পর তার মুক্তি মেলে এবং কয়েক মাস পর তিনি নির্বাসনে চলে যান।

২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এফ এম মাসুমকে র‍্যাব সদস্যরা নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে যায়। মাসুম দরজা খুলতে দেরী করায় তার বাড়ির দরজায় তাকে প্রহার করা হয়। মাসুম নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেয়ার পরও তাকে হাত-পা বেধে স্থানীয় র‍্যাব কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর মারাত্মকভাবে নির্যাতন করা হয়। একজন মাদক ব্যবসায়ীকে ধরার জন্য র‍্যাবের ব্যাপক প্রয়াস চলাকালে মাসুমকে গ্রেফতার করা হয় এবং একটি বিশেষ পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় পাওয়ার পর তার সমস্যা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। মাসুমের ঘটনাটি ছিল বিচ্ছিন্ন এবং সরকারি সংস্থাগুলো আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে তাদের ভুল স্বীকার করে। কিন্তু তাকে নির্যাতন করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলাকালে সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় বিভ্রান্তির নজির রয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর বেশ কিছু সাংবাদিকের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনা ঘটে। তারা সেখানে একটি যুব সংগঠনের বিক্ষোভ কর্মসূচির স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইউনিয়নগুলো তখন ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহনের দাবী জানায়। ফলে, সংশ্লিষ্ট থানার প্রধান ও তার আটজন অধঃস্তনকে বরখাস্ত করা হয়।

কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার বাড়ছে

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার সম্ভবত দেশে একটি অধিকতর অংশগ্রহনমূলক ও গণতান্ত্রিক গণমাধ্যম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছে। বেশ কিছু সুশীল সমাজ সংগঠন বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উদার নীতি ভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছিল। জাতীয় 'জরুরি' পরিস্থিতির মেয়াদে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম হচ্ছে একটি কমিউনিটি রেডিও পলিসি যা অপেক্ষাকৃত বিধি-নিষেধমুক্ত এবং ২০০৮ সালে সম্প্রচারের লাইসেন্স গ্রহনের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়।

বেশ কিছু আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাথমিক বাছাইয়ে ১১৬টিকে নির্বাচন করা হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শেষে ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ১২টি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক অনুমোদন দেয়া হয় এবং কয়েক সপ্তাহ পর দ্বিতীয় দফায় আরো দুটি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এসব প্রাথমিক লাইসেন্সের প্রাথমিক মূল্যায়ন এখনও করা হয়নি। এসব স্টেশনের সম্ভাব্য সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য বাস্তবিকতার প্রশ্ন ও কার্যকারিতার বিষয়গুলোর সুরাহা করতে হবে।

কমিউনিটি রেডিওর প্রাথমিক উদ্যোক্তারা ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাদেরকে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে মাত্র একবছরের মধ্যে সম্প্রচার শুরু করার সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েক মাস গত হয়ে যাওয়ার পরও ফিকোয়েন্সী বরাদ্দ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার আদেশ অনুমোদন করা হয়নি। বাংলাদেশ যেভাবে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার ব্যবস্থা উদার করেছে তাতে শ্রীলঙ্কা ছাড়া দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। নীতিগত অঙ্গীকার বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে এখনও সমস্যা রয়ে গেছে। তাসত্ত্বেও, এটি নিঃসন্দেহে দেশে গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরবর্তী ক্ষেত্র।

তথ্য অধিকার

২০০৮ সালে 'জরুরি' শাসন ব্যবস্থার মেয়াদে একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) প্রবর্তন করেছে। পরে, রীতি মাফিক আইন হিসেবে এটির খসড়া প্রণয়ন করে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের সংসদে পাস করা হয়েছে। বৈশ্বিক মান

বিবেচনায় এই আইনটি নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত অধিকার ভিত্তিক সুবিধা লাভের বিষয়ে সবচেয়ে উদার বলে স্বীকৃত। অধিকারের চর্চা তদারককারী পরিষদের গঠন এবং মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিতর্কিত প্রক্রিয়া। জবাবদিহিতার মৌলিক পদক্ষেপগুলো প্রবর্তনের লক্ষ্যে যে কোন আইনগত উদ্যোগ গ্রহনের মতোই আরটিআই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। এই আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সুশীল সমাজ সংগঠন এগিয়ে আসছে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন যে, তারাও ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আইএফজে প্রণীত এই পরিস্থিতি প্রতিবেদনটি হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে সংস্থার অব্যাহত সম্পৃক্ততার অংশ। এই রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য একজন আইএফজে প্রতিনিধি ২০১২ সালের মে মাসে রাজধানী ঢাকায় গণমাধ্যম পেশাজীবিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য বাংলাদেশ সফর করেন। এই সফরকালে বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরামের (বিএমএসএফ) খায়রুজ্জামান কামাল ও সিনিয়র সাংবাদিক সালিম সামাদের ভূমিকা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়া, সুগভীর বিশ্লেষণ ও তথ্য বিনিময় করার জন্য আইএফজে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেঃ

আবদুল জলিল ভুইয়াঁ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
আবদুস শহীদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন
আদিলুর রহমান খান, অধিকার
আতাউর রহমান, বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরাম
আজিজুর রহিম পিউ, সিনিয়র ফটো সাংবাদিক
ডেভিড বার্গম্যান, নিউ এজ
একরামুল হক চৌধুরী, শীর্ষ নিউজ
হারুন হাবীব, সিনিয়র সাংবাদিক
ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
মাহমুদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, আমার দেশ
মাইনুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন

মোহাম্মদ নূর খান লিটন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র
মনজুরুল আহসান বুলবুল, বৈশাখী টেলিভিশন
নাইমুল ইসলাম খান, সম্পাদক, আমাদের সময়
নাসিরউদ্দিন এলান, অধিকার
নূরুল কবির, সম্পাদক, নিউ এজ
অলি উল্লাহ নোমান, সংবাদদাতা, আমার দেশ
পি কে দাস, বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
রেহনুমা আহমেদ, কলামিস্ট, নিউ এজ
রুহুল আমিন গাজী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
শহীদুল আলম, পাঠশালা ও দৃক একাডেমী
শামসুল হক টুকু, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
***